Vol. 54 | No. 3 | 2017

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি : একটি নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Volume	54
Issue	3
Year	2017
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মো. শওকত হোসেন
Published online	June 1, 2017
DOI	10.62328/sp.v54i3.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i3.6
Pages	১২৭-১৪৯
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি : একটি নন্দনতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

মো. শওকত হোসেন*

সারসংক্ষেপ: সাহিত্যবিচার বা সাহিত্যের মূল্যায়ন নন্দনতত্ত্বের এবং, বিশেষকরে, সাহিত্য তথা শিল্পতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোন্ সাহিত্য উন্নত, কোন্ সাহিত্য কাম্য, সাহিত্যের উৎকর্ষ কীসের ওপর নির্ভর করে, সাহিত্যে কোন্ বিষয়গুলো থাকা দরকার আর কোন্ বিষয়গুলো বর্জনীয় ইত্যাদি বিষয় সাহিত্য বিচার, সাহিত্য সমালোচনা বা সাহিত্য মূল্যায়নের সাথে সম্পর্কিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিভিন্ন লেখায় সাহিত্য মূল্যায়ন বা সাহিত্য বিচারের কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছেন। তাঁর এসব লেখনীর মধ্য দিয়ে সাহিত্যবিচারের রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ নির্ধারণ ও মূল্যায়নই এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য। এখানে দেখানো হয়েছে যে সাহিত্যবিচারে রবীন্দ্রনাথের দৃঙ্গিভঙ্গি সর্বক্ষেত্রেই অভিনব নয়, তবে তাঁর বক্তব্যে স্ববিরোধিতা নেই, এবং সার্বিকভাবে তা তাঁর সামগ্রিক নন্দনতাত্ত্বিক ভাবনা এমনকি জীবন-ভাবনার সাথেও সম্পর্কিত।

সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে সাহিত্যের লক্ষ্য নির্ধারণ প্রাথমিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে মনে করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য মানুষের কোন বৈষয়িক প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য নিবেদিত হওয়ার বিষয় নয়; এর মূল লক্ষ্য হলো মানুষকে আনন্দ দেওয়া। তিনি শিল্পের বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অনেকটা কলা-কৈবল্যবাদী; এই মত অনুযায়ী "শিল্পের জন্য শিল্প (art for art's sake)" হবে শিল্প বা সাহিত্যের মূল শ্লোগান। তবে রবীন্দ্রনাথ শিল্পের মাধ্যমে স্বার্থহীন এক নির্মল আনন্দ অর্জিত হতে পারে বলে মনে করেন। তাঁর মতে, সাহিত্য আমাদের মনে এক ধরনের উপলব্ধি জাগিয়ে তোলে, এই উপলব্ধি রসাত্মক উপলব্ধি। আর এই উপলব্ধিই আমাদের মনকে এক নির্মল আনন্দ প্রদান করে। রবীন্দ্রাথের ভাষায় :

> আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ। অনুভূতির গভীরতা দ্বারা

*সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।

> বাহিরের সঙ্গে অন্তরের একাত্মবোধ যতটা সত্য হয় সেই পরিমাণে জীবনের আনন্দের সীমানা বেড়ে চলতে থাকে, অর্থাৎ নিজেরই সত্তার সীমানা। ... বলা বাহুল্য, বিশুদ্ধ সাহিত্য অপ্রয়োজনীয়, তার সে রস অহৈতুক। মানুষ সেই দায়মুক্ত বৃহৎ অবকাশের ক্ষেত্রে কল্পনার সোনার কাঠি ছোঁয়া। সামগ্রিকে জাগ্রত করে জানে আপনারই সত্তায়। আর সেই অনুভবে অর্থাৎ আপনারই বিশেষ উপলব্ধিতে তার আনন্দ। এই আনন্দ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে জানিনে।(রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ, ১৩৪১)

তাই যে সাহিত্য যথার্থভাবে নিঃস্বার্থ বৈষয়িক প্রয়োজনের বাইরে এক নির্মল বিশুদ্ধ আনন্দ সৃজন করতে পারে, রবীন্দ্রনাথের মতে, সেই সাহিত্য বা সেই শিল্পই হলো সত্যিকারের ভালো সাহিত্য বা ভালো শিল্প। মানুষকে বৈষয়িক কোন সমৃদ্ধি এনে দেবে, ব্যবসায়িকভাবে লাভবান করবে — এমন কোন কমিটমেন্ট সাহিত্যের থাকা জরুরি নয় বলে তিনি মনে করেন। তাঁর মতে, সাহিত্য রসের জোগান দেবে। ভালো সাহিত্যেকে তাই শিল্পরস প্রদানকারী হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়: "আমাদের পেট ভরবার জন্যে — জীবনযাত্রার অভাব মোচন করার জন্যে আছে নানা বিদ্যা, নানা চেষ্টা; মানুষের শূন্য ভরবার জন্যে — তার মনের মানুষকে নানাভাবে নানা রসে জাগিয়ে রাখার জন্যে আছে তার সাহিত্য, তার শিল্প।" (রবীন্দ্রনাথ, বৈশাখ, ১৩৪১)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈষয়িক উদ্দেশ্যবিহীন এই কলাকৈবল্যবাদী মতের বিপক্ষে অনেক সাহিত্যতাত্ত্বিকই ভিন্নমত প্রকাশ করেন। প্লেটো সাহিত্যকে কল্যাণের বাহক হিসেবে দেখতে চেয়েছেন, যার মাধ্যমে সমাজে নৈতিকতার প্রচার ও প্রসার ঘটানো যায়। তিনি সুনীতি, সুরুচি ও সুবিচারের বাহক হিসেবে সাহিত্যকে দেখতে চেয়েছেন। এটা সাহিত্য বা শিল্পকে নিতান্তই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার নামান্তর। এভাবে সাহিত্য বা শিল্পকে কোন কিছুর মাধ্যম বা উপায় হিসেবে বিবেচনা করার কথা লিও তলস্তয়ও বলেছেন। তিনি তাঁর *What is Art?* নামক গ্রন্থে শিল্পকে মানবকল্যাণের বাহক ও সহমর্মিতা প্রকাশের উপায় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। রাস্কিনের মতে, সত্য প্রকাশই হচ্ছে শিল্পের মূল কাজ। মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বে সাহিত্য বা শিল্পকে সামাজিক সমস্যা প্রকাশের, সমাজ বদলের মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছে। অর্থাৎ সাহিত্য বা শিল্পকে এখানে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার যথার্থতা দেখানো হয়েছে। সাহিত্য বা শিল্প তাই এখানে একটি উপায় বা মাধ্যম। অস্তিত্ববাদী দার্শনিক জ্যাঁ পল সার্ত্র মনে করেন যে, সাহিত্যকে হতে হবে "অঙ্গীকারবদ্ধ" (engaged literature)। কেননা একজন সাহিত্যিককে অবশ্যই সমাজ পরিবর্তনের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি তাঁর *What is Litarature?* নামক গ্রন্থে এই অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়াকে লেখকের নৈতিক ও রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা বলে তুলে ধরেন। অর্থাৎ তিনিও "সাহিত্যের জন্য সাহিত্য" — এমন তত্ত্ব অনুমোদন করেননি। তবে কলাকৈবল্যবাদী এই ভাবনার বিরুদ্ধে বেশ জোরালোভাবে মন্তব্য করেন রুশ

চিত্রসমালোচক চের্চিসেভস্কি, তিনি বলেছেন : " 'শিল্পের জন্য শিল্প' কথাটি আমার কাছে অদ্ভুত লাগে। যেমন অদ্ভুত লাগবে 'ধন-সম্পদের জন্য ধন সম্পদ' বা 'বিজ্ঞানের জন্য বিজ্ঞান' এ ধরনের শ্লোগান যদি কেউ দেয় – সেগুলি শুনে।" (শ্রী সুহাস, ১৯৯০ : ২০৯) তিনি আরও বলেন "ধন-সম্পদ মানুষের ব্যবহারের জন্য, বিজ্ঞান যেমন মানুষের অগ্রগমনের সাহায্যকারী, শিল্পকলাকেও মানুষের জীবনের সেবার অঙ্গ হিসেবেই দেখতে হবে।" (শ্রী সুহাস, ১৯৯০ : ২০৯)

যাই হোক রবীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্যবাদী মতের পক্ষে কথা বললেও তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে সমাজ বিবর্তনমূলক, নৈতিক শিক্ষামূলক, তাতে মানবতাবাদী অনেক আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সাহিত্য কেবল কোন উদ্দেশ্যে নিবেদিত হলে এর যথার্থ মান নাও থাকতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা যথার্থ মনে করা চলে। রবীন্দ্রনাথ এমন কথা অবশ্য বলেননি যে, সাহিত্য কোন সামাজিক সংস্কার বা নৈতিক শিক্ষা প্রদানে সহায়ক হতে পারবে না। তিনি মূলত বলতে চেয়েছেন যে, সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে ঐসকল বাহ্যিক মানদণ্ড অপেক্ষা তার শৈল্পিকতা, রসপ্রদান ও আনন্দ প্রদানের ক্ষমতাকেই বেশি করে বিবেচনায় আনতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, সাহিত্যের বিষয় হবে ব্যক্তিগত, শ্রেণিগত নয়। তিনি 'ব্যক্তি' শব্দটির ধাতুগত অর্থের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, "স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত হয়ে উঠেছে তাই ব্যক্তি। সেই ব্যক্তি স্বতন্ত্র। বিশ্বজগতে তার সম্পূর্ণ অনুরূপ আর দ্বিতীয় নেই।" (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬) সাহিত্যে কোন কিছুকে ব্যক্ত করা হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এই ব্যক্ত করার বিষয়টি কেবল ব্যক্তিতে সীমাবদ্ধ নয় বলে তিনি মনে করেন। অর্থাৎ মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা, নদী, পর্বত, সমুদ্র, ভালো জিনিস, মন্দ জিনিস, বস্তুগত জিনিস, ভাবগত জিনিস সবই ব্যক্ত হতে পারে সাহিত্যে। [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যবিচার*] রবীন্দ্রনাথের মতে, বিষয় যাই হোক সাহিত্যে যদি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হতে পারে, এমনভাবে ব্যক্ত হতে পারে যে তা মানুষের অনুভূতিতে সাড়া জাগাতে পারে তাহলে অবশ্যই তার শিল্পমূল্য বা সাহিত্যমূল্য থাকবে। অর্থাৎ সার্থকভাবে ব্যক্ত হবার ওপরই সাহিত্যমূল্য নির্ভর করে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের কোন চরিত্র বা বিষয় যথার্থভাবে ব্যক্ত হওয়া নির্ভর করে তা স্বকীয়ভাবে ব্যক্ত বা উদ্ভাসিত হবার ওপর। যদি কোন কিছু স্বকীয়ভাবে মূল্যবান এমনটি দেখানো যায় তাহলে তার মধ্যে সাহিত্যিক মূল্য নির্ধারিত হয়ে যায়। এই গুণটি কোন চরিত্রে, বস্তুতে বা বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত করার কাজটি করতে হয় সাহিত্যিককে। সাহিত্যিক তখনই সার্থক হন যখন তিনি এমনভাবে কোন কিছুকে ব্যক্ত করতে পারেন যা হয়ে ওঠে একটি সার্থক নমুনা; যার দ্বারা মানুষ একটি মানদণ্ড কল্পনা

করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা বলতে পারি, শেক্সপিয়র যখন শাইলক চরিত্র সৃষ্টি করেন তখন তিনি এমন একটি নমুনা সৃষ্টি করেন যা হয়ে ওঠে সুদভোগী মানুষের সার্থক নমুনা। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন জমিলা চরিত্র সৃজন করেন তখন তা হয় প্রতিবাদী নারীর সার্থক নমুনা। এই চরিত্রগুলো সার্থকভাবে ব্যক্ত হতে পেরেছে, কেননা এগুলো স্বকীয় মহিমায় ব্যক্ত হয়ে উঠেছে। এসব চরিত্র মানুষের মনে সার্থকভাবে দাগ কাটে। রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যে ব্যক্ত হবার এই গুণ সাহিত্যিক তার কল্পনাশক্তি বা রচনাশক্তির মাধ্যমে কোন কিছুর মধ্যে প্রবেশ করান। সাহিত্যবিচার করতে এই ব্যক্ত হবার গুণটির ওপরই রবীন্দ্রনাথ বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সাহিত্যিক সার্থক হলে তার সৃজিত বা ব্যক্ত করা বিষয়টি চিরন্তন হয়ে ওঠে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। যেসকল সাহিত্যিকের রচনাশৈলী খুবই উন্নত কেবল তারাই এ কাজটি করতে পারেন বলে তিনি মনে করেন।

কোন মানবিক চরিত্র বা অন্য যা কিছু সাহিত্যে ব্যক্ত হয় তার মূল্য মূলত স্বকীয়ভাবে ব্যক্ত হবার ওপর নির্ভর করে বলে রবীন্দ্রনাথ মত প্রকাশ করেছেন — এমনটি আগেও বলা হয়েছে। তবে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্ত হওয়ার স্বকীয়তার ওপর এত বেশি জোর দিয়েছেন যে, তিনি এর মধ্যে কোন শ্রেণিগত বা জাতিগত প্রভাবের লেশমাত্র রাখতে চান না। তাঁর মতে, সাহিত্যে যা ব্যক্ত হবে তা স্বকীয় গুণে ব্যক্ত হবে, জাতিগত গুণে বা প্রভাবে নয়। ভালো চরিত্র হোক বা মন্দ চরিত্র হোক তা সাহিত্যে সমাদৃত হবে তখন যখন তা স্বকীয় গুণে ব্যক্ত হবে। কোন শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে নয়, বরং ঐ চরিত্রটিই হবে কোন শ্রেণির নমুনা। রবীন্দ্রনাথের এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি জমিলা নারী শ্রেণির প্রতিনিধি রূপে সমাদৃত নয়। বরং জমিলা স্বমহিমায় ব্যক্ত হতে পেরেছে এবং সে হয়ে উঠেছে চিরন্তন কোন 'নমুনা' — এজন্য জমিলার ব্যক্ত হবার সার্থকতা রয়েছে; সার্থক হয়েছে সাহিত্যিকের ব্যক্ত করার কলা-কৌশল। তবে এভাবে স্বকীয় গুণে ব্যক্ত করে কোন কিছুকে সমাদৃত করে তোলা বা চিরন্তন করে তোলা সাহিত্যিকদের নিকট কঠিন কাজ বলে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন। আর এ কারণে অনেকে জাতিগত গুণ দিয়ে কোন শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী রূপে কোন কিছুকে সাহিত্যে ব্যক্ত করতে চান। তাঁর মতে, এই প্রক্রিয়া নিম্নমানের। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> ব্যক্ত রূপের সাহিত্য মূল্যটি নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। এই জন্যেই সাহিত্যবিচারে অনেকেই ব্যক্তি পরিচয়ের দুরূহ কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে শ্রেণির পরিচয় দিয়ে থাকেন। এই সহজ পন্থাকে সাধারণত আমাদের দেশের পাঠকেরা অশ্রদ্ধা করেন না; বোধ করি তার প্রধান কারণ, আমাদের দেশ জাত-মানার দেশ। মানুষের পরিচয়ের চেয়ে জাতের পরিচয়ে আমাদের চোখ পড়ে বেশি। আমরা বড়লোক বলি যার বড়ো পদ, বড়ো মানুষ বলি যার অনেক টাকা। আমরা জাতের চাপ, শ্রেণির চাপ, দীর্ঘকাল ধরে পিঠের উপর সহ্য করেছি; ব্যক্তিগত মানুষ পঙ্‌ক্তিপূজক

> সমাজের তাড়নায় আমাদের দেশে চিরদিন সংকুচিত। বাঁধা রীতির বন্ধন আমাদের দেশে সর্বত্রই। ... শ্রেণির কুহেলিকার মধ্যে ব্যক্তি অদৃশ্য। সেই ঝাপসা দৃষ্টির মনোবৃত্তি আমাদের চলে গেছে তা বলতে পারিনে। এই ঝাপসা দৃষ্টিই সাহিত্য রচনায় ও অনুভূতিতে সকলের চেয়ে বড়ো শত্রু। কেননা সাহিত্য রসরূপের সৃষ্টি। সৃষ্টি মাত্রেরই আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়ে খুবই সুস্পষ্ট মত ব্যক্ত করেন যে, কোন জাতিগত সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কোন কিছুকে সাহিত্যে ব্যক্ত করার চেষ্টা সঠিক নয়, বরং ব্যক্তি হিসেবে বা বিশেষ বিষয় হিসেবে ব্যক্ত করানোটাই সাহিত্যবিচারের মানদণ্ড হওয়া জরুরি। তিনি তাঁর *যোগাযোগ* উপন্যাসের কুমু চরিত্র নিয়ে কিছু সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে, কুমু গোটা নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে কিনা তা নিয়ে অনেকে সমালোচনা করেছেন। কিন্তু কুমুকে স্বমহিমায় দাঁড় করানোই ছিলো তাঁর লক্ষ্য, কোন জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কারো রূপ ব্যক্ত করা সাহিত্যের প্রকৃত লক্ষ্য হতে পারে না বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, শ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য বা রূপ নির্ণয় সাহিত্যিকের কাজ নয়, বিজ্ঞানের কাজ। তাঁর ভাষায় :

> মানবপ্রকৃতির যা কিছু সাধারণ গুণ তারই প্রতি লক্ষ্য মনোবিজ্ঞানের, আর ব্যক্তি বিশেষের যে অনন্য সাধারণ প্রকৃতি তারই প্রতি লক্ষ্য সাহিত্যের। অবশ্য একথা বলাই বাহুল্য, নারীকে আঁকতে গিয়ে তাকে অ-নারী করে আঁকা পাগলামি। বস্তুত সে কথা আলোচনা করাই অনাবশ্যক। সাহিত্যে কুমুর যদি কোনো আদর হয় তো সে ব্যক্তিগত কুমু বলেই, নারী শ্রেণির প্রতিনিধি বলে নয়। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথ এখানে খুবই সুস্পষ্ট করে বিজ্ঞানের জাতিগত বৈশিষ্ট্য বিচারের সাথে সাহিত্যের চরিত্র রূপায়ণের পার্থক্য দেখিয়েছেন। চরিত্র সৃজন বা কোন বিশেষ চরিত্রকে সাহিত্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে যে তাকে ঐ শ্রেণির সর্বজনীন গুণ ধারণ করে শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের মতের বিরোধিতা করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গিকে যথার্থ বলে মনে করা যায়। কেননা সাহিত্যে যখন কোন বিশেষ চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে তখন ঐ চরিত্রটি মূলত গড়পড়তা চরিত্রের চাইতে পৃথক হয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। কোন শ্রেণির সার্থক প্রতিনিধিরূপে নয়, বরং স্বকীয় মহিমায় সংশ্লিষ্ট চরিত্রটির অনন্যতার জন্যই চরিত্রটি আদরণীয় হয়ে ওঠে। দেবদাস আদরণীয় হয়েছে এজন্য নয় যে, সব প্রেমিকই দেবদাসের মতো; বরং অন্যান্য প্রেমিকের চাইতে দেবদাসের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে; এ ক্ষেত্রে দেবদাস চরিত্রটি অনন্য বলেই সাহিত্যে এটা কদর লাভ করেছে। রোমিও বা জুলিয়েট চরিত্রের বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। তাই রবীন্দ্রনাথের চরিত্র রূপায়ণের এই অজাতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবিকভাবেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য বলে প্রতীয়মান হয়।

অনুকরণ সাহিত্যের জন্য কাম্য কিনা এই বিষয়টি সাহিত্য সামালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেই প্লেটো-অ্যারিস্টটলের সময় থেকে এ প্রশ্নটি শিল্প বা সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে আলোচিত হচ্ছে। প্লেটো সাহিত্যসহ সর্বপ্রকার শিল্পকেই অনুকরণ (imitation) বলেছেন। তিনি অনুকরণ বলতে বুঝেছেন 'নকল' বা প্রতিলিপিকে। আর সাহিত্য বা শিল্প অনুকরণ করে বা নকল করে এমন বিষয়কে, প্লেটোর মতে, সে বিষয়সমূহও নকল। তাই শিল্প বা সাহিত্য হলো নকলের নকল। অতএব, প্লেটোর নিকট অনুকরণ বা সাহিত্যিক অনুকরণ একেবারেই খাঁটি অনুকরণ নয়। তিনি অবশ্য ভালো কিছুর অনুকরণের প্রতি সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। অ্যারিস্টটল সাহিত্য বা শিল্পের অনুকরণকে সরাসরি কোন বাস্তব বা প্রকাশিত বিষয়ের নকল না বলে এক ধরনের রূপকল্পের অনুকরণের কথা বলেছিলেন। এখানে অনুকরণকে অর্থহীন বা নিছক ছায়াস্বরূপ প্রতিলিপি বলা হয়নি। প্লেটোর মতো করে তিনি বাহ্য জগতকে ছায়াস্বরূপ বলেও মনে করেননি। যাই হোক, প্লেটো- অ্যারিস্টটলের মতো অধিবিদ্যকভাবে অনুকরণকে না দেখে রবীন্দ্রনাথ অনুকরণের ব্যবহারমূলক বা ব্যবহারিক দিকটির ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি অনুকরণকে একটি সদর্থক অর্থে সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। সেই অনুকরণ হলো অনুপ্রেরণা, পথনির্দেশমূলক; নিছক নকল নয়। কোন কিছুকে নকল করা অর্থে অনুকরণকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে কাম্য মনে করেননি। কিন্তু সাহিত্য যদি কোন কিছু দ্বারা বা কোন সাহিত্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, অনুপ্রেরণা লাভ করে স্বকীয় মাধুর্য নিয়ে প্রকাশিত হয় তাহলে তার শিল্পমূল্যকে রবীন্দ্রনাথ অগ্রাহ্য করেননি। তাঁর ভাষায় :

> নীলনদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেরই বর্ষা। তাতে ভারতে ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক তাকে যেন ভর্ৎসনা না করেন- যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

অর্থাৎ অনুকরণ বা প্রভাব অনেকটা স্বাভাবিক বিষয়, তবে তা গ্রহণ করে যে সৃজনকর্ম হবে তার নতুনত্ব থাকা চাই, এবং তার অনুকরণের বিষয়টি বা দান গ্রহণের বিষয়টিকে স্বীকার করতে হবে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, স্বীকার না করে কোন অনুকরণ করলে তা হবে "চুরি"। তিনি বলেন :

> এক সময় ভারতীয় প্রভাব যখন প্রাণপূর্ণ ছিল তখন মধ্য ও পূর্ব এশিয়া তার নিকট সংস্পর্শে এসে দেখতে দেখতে প্রকৃত শিল্পসম্পদে আশ্চর্যরূপে চরিতার্থ হয়েছিল। তাতে এশিয়ায় এনেছিল নবজাগরণ। এজন্য ভারতের বহির্বর্তী এশিয়ার কোন অংশ যেন কিছুমাত্র লজ্জিত না হয়। কারণ, যে কোন দানের মধ্যে শাশ্বত সত্য আছে তাকে যে-কোন লোক যদি যথার্থভাবে আপন করে স্বীকার করতে পারে তবে সে দান সত্যই তার আপনার হয়। অনুকরণই চুরি, স্বীকরণ চুরি নয়। মানুষের সমস্ত

> বড়ো বড়ো সভ্যতা এই স্বীকরণ শক্তির প্রভাবেই পূর্ণ মাহাত্ম্য লাভ করেছে। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

এখানে নিছক অনুকরণ তথা দান গ্রহণের বিষয়টি স্বীকার না করে অনুকরণ করাকে "চুরি" বোঝানো হয়েছে এবং সাহিত্যে বা শিল্পে তা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তবে তিনি এটাও স্বীকার করেন যে, দান স্বীকার করলে বরং অনুকরণকারীর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। এভাবে অনুকরণ করে এগিয়ে যেতে পারলে বরং তা গৌরবেরই বিষয় হয় বলে তিনি মনে করেন। তিনি সমসাময়িক ইউরোপীয় সভ্যতার উদাহরণ টেনে বলেন :

> বর্তমান যুগে য়ুরোপ সর্ববিধ বিদ্যায় ও সর্ববিধ কলায় মহীয়ান। চারিদিকে তার প্রভাব নানা আকারে বিকীর্ণ। এই প্রভাবের প্রেরণায় য়ুরোপের বহির্ভাগেও দেশে দেশে চিত্তজাগরণ দেখা দিয়েছে। এই জাগরণকে নিন্দা করা অবিমিশ্র মূঢ়তা। য়ুরোপ যে কোন সত্যকে প্রকাশ করেছে তাতে সকল মানুষেরই অধিকার। কিন্তু সেই অধিকারকে আত্মশক্তির দ্বারাই প্রমাণ করতে হয়, তাকে স্বীকার করে নিজের প্রাণের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া চাই। আমাদের স্বদেশানুভূতি, আমাদের সাহিত্য য়ুরোপের প্রভাবে উজ্জীবিত, বাংলাদেশের পক্ষে এটা গৌরবের কথা। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

সাহিত্যের কোন জাত বিচার থাকা দরকার নেই বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। সত্য যেমন সর্বত্রই সত্য, সবারই তা অনুসরণ করা দরকার; তেমনি সাহিত্য বা শিল্পও সকলের অনুসরণীয় হতে পারে। যারা বিদেশি প্রভাবের কথা বলে কোন সাহিত্যকে খাটো করতে চায় — তাদেরকে বর্ণসংকরতা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

সাহিত্য বা শিল্পে অনুকরণ নিয়ে চলে আসা বহু পুরোনো বিতর্কের একটি সুন্দর সমন্বয়মূলক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত অভিমতের মাধ্যমে। তিনি সুস্পষ্ট করেই দেখান যে, কোন্‌টা চুরি আর কোন্‌টা অনুকরণ। বিজ্ঞানও স্বীকার করে যে, মানুষ অনেকটাই অনুকরণপ্রিয় জীব। অ্যারিস্টটলও একথা সুস্পষ্ট করে বলেছিলেন। (Aristotle, 2008 : ch. 5) তাই মানুষ সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রেও অনুকরণ করবে— এটা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই অনুকরণ যেন হুবহু কোন কিছুর নকল না হয় রবীন্দ্রনাথ এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, অনুকরণ করার যোগ্যতা সকলের থাকে না। কেবল তারাই অনুকরণ করতে পারেন যাদের সৃজন করার যোগ্যতা আছে। এই যোগ্যতা হলো কোন কিছু থেকে প্রভাবিত হলেও নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে কোন কিছুকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করা। এটা দোষের কিছু নয়; বরং এটাই স্বাভাবিক। তাই রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ সম্পর্কিত এই মত বাস্তবধর্মী ও প্রগতিমূলক বলে মনে হয়।

সাহিত্যবিচারের বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে রবীন্দ্রনাথ সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করেন। তিনি বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব দেন। বিশ্লেষণ যদি সংগ্রহ করার জন্য হয় তাতে, তাঁর মতে, দোষের কিছু নেই। কেননা অন্য কোন সাহিত্য-উপাদান থেকে সাহিত্যিক নিজের সৃজনের উপাত্ত সংগ্রহ করলেও তাতে তার স্বকীয়তা নষ্ট হয় না, যদি তিনি উপাদানগুলোকে নিজের মতো করে বিন্যাস করে নতুন কিছু সৃজন করতে পারেন। তাঁর মতে, সৃজনের স্বকীয়তা নির্ভর করে উপাদানের ওপর নয়, বরং উপাদানসমূহকে সংযুক্তকরণের ওপর, তার প্রকাশের ওপর। তিনি পারমাণবিক গঠন অনুযায়ী পদার্থের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উদাহরণ দিয়ে দেখান যে, সকল পদার্থের উপাদানই পরমাণু হলেও পারমাণবিক সংখ্যার সংমিশ্রণের ওপর বস্তুর প্রকৃতি নির্ভর করে। তাই উপাদান এক হলেও বিন্যাস ও সংযোজনের কারণে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> কার্বন ও নাইট্রোজেন উপাদানের মধ্যে ধরা পড়া সত্ত্বেও জোর করে বলতে হবে যে, সন্দেশ পচা মাংসের সঙ্গে এক শ্রেণীভুক্ত হতে পারে না। কেননা, উভয়ে উপাদানে এক কিন্তু প্রকাশে স্বতন্ত্র। চতুর লোক বলবে, প্রকাশটা চাতুরী, তার উত্তরে বলতে হয়, বিশ্বজগৎটাই সেই চাতুরী। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক, ১৩৩৬)

রবীন্দ্রনাথ এখানে যা বলতে চান তা হয়তো এই যে, মানুষ কোন কিছু শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারে না, উপাদানের দরকার হয়। সেই উপাদান মানুষ বিশ্বজগৎ থেকেই সংগ্রহ করে। বিধাতার সৃজন প্রক্রিয়ার সাথে মানুষের সৃজন প্রক্রিয়ার পার্থক্য এখানেই। বিধাতা প্রকৃত স্রষ্টা। তিনি শূন্য থেকে সৃষ্টি করতে পারেন। আর মানুষের সৃজন প্রক্রিয়া জগতের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। জাগতিক উপাদান নিজের কল্পনা অনুযায়ী বিভিন্নভাবে সাজিয়েই মানুষ কোন কিছু সৃষ্টি করে। এই সন্নিবেশ ঘটানো বা সাজিয়ে তোলাই মানুষের কৃতিত্ব, একে যদি চাতুর্য বলা হয় — তাহলে তা এক প্রকার চাতুর্য বটে। তবে, রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের প্রকৃত মূল্যমান বিচার করতে হলে তাকে কেবল বিশ্লেষণ করলেই হবে না; প্রয়োজন হলো সঠিক ব্যাখ্যা করা। ব্যাখ্যা করার মাধ্যমেই সাহিত্যের মূল্য-মান বিচার করা যায়। (রবীন্দ্রনাথ, কার্তিক ১৩৩৬)

এখানেও রবীন্দ্রনাথ সৃজনশীলতার ওপর বেশি গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মানুষের কল্পনা মূলত কোন বাস্তব বিষয়কে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, হিউম প্রমুখ দার্শনিক দেখিয়েছেন যে, ধারণারও অনুষঙ্গ থাকে। হিউমের ভাষায় এটা হচ্ছে "association of ideas." তিনি দেখান যে, আমাদের কল্পনা যতই স্বাধীন হোক না কেন তারও নিয়ম রয়েছে। অভিজ্ঞতার কাছে তা ঋণী। (Hume, 1969 : 57-60) রবীন্দ্রনাথও দেখান যে, একজন সৃজনশীল সাহিত্যিক বাস্তবের মালমসলা নিয়েই কাজ করেন। তার সংযুক্তি ও বিযুক্তি ঘটান তার কল্পনার ছাঁচে। তাই উপাদান বিশ্লেষণ নয়, তার

মাধ্যমে যে সৃজনকর্ম সাহিত্যিক উপহার দেন তার বিশেষত্বের ওপরই, প্রকাশের কারুকার্যের ওপরই গুরুত্ব প্রদান করা জরুরি।

সাহিত্যের মানবিচার এর বিষয়বস্তুর চাইতে এর রূপের ওপর বেশি নির্ভর করে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, সাহিত্যিক কোন্ বিষয় নিয়ে সাহিত্য সৃজন করলেন সেটা নিতান্ত উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু যে রূপ বা শিল্প তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন তা-ই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক সাহিত্যিক বা শিল্পী যখন কোন সাহিত্য বা শিল্প সৃজন করেন তখন তার একটি রূপকল্প অনুযায়ী তিনি তা সৃজন করেন। অ্যারিস্টটল সর্বপ্রথম এই রূপকল্পের ধারণা প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর মতে, শিল্পী জাগতিক ঘটনা বা বিষয় তথা বাস্তবতার নিছক অনুকরণ করেন না। তিনি অনুকরণ করেন রূপকল্পের। প্রকৃতির বা বাস্তবতার পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাহিত্যিক বা শিল্পীর মনে ভাবের উদয় হয়; এই ভাবকে সৃজনী কল্পনার মাধুরি দিয়ে শিল্পী এক ধরনের পূর্ণতা দিতে চেষ্টা করেন। এই পূর্ণতাসূচক রূপ, অ্যারিস্টটলের নিকট, সাহিত্যিক বা শিল্পীর রূপকল্প। এই রূপকল্পের আদলে সে তার সাহিত্য বা শিল্প সৃজন করেন। রবীন্দ্রনাথের ভাবনায়ও এই মতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। তিনি এই রূপকল্পের তথা সাহিত্যরূপ বা শিল্পরূপের ওপর ব্যাপক গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তবে, তাঁর মতে, শিল্প যাচাই করতে হলে বা সাহিত্যবিচার করতে হলে শিল্পী বা সাহিত্যিক যে রূপটি প্রকাশ করে বা সৃজন করে তার ওপর ভিত্তি করেই করতে হয়। কেননা মানসিক রূপকল্পের বিষয়টি শিল্পী বা সাহিত্যিকের একান্ত ব্যক্তিগত। তিনি যে সাহিত্যরূপ বা শিল্পরূপ গড়ে তোলেন তার মানই বিচার্য বিষয়। সাহিত্যিক বা শিল্পী এ ক্ষেত্রে কতটা স্বকীয়তার পরিচয় দিতে পারলেন তা-ই বিশেষভাবে বিবেচ্য বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। সাহিত্যে কেউ বিশেষভাবে মূল্যায়িত হলে তাকে এই ভাব বা রূপকল্প প্রকাশে বিশেষত্ব প্রদান করতে হয় বলে তিনি মনে করেন। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর অভিনবতারও কোন আবশ্যিকতা নেই; বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি সাহিত্যের মানবিচারে খুব একটা বিচার্য বিষয় নয় বলেও রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, কী বিষয়ে বা কী উপাদান দিয়ে একটি বস্তু তৈরি হলো তার চেয়ে ঐ বস্তুর বাস্তব রূপটি কতটা উন্নত বা কল্যাণকর তা-ই আমরা দেখে থাকি। সাহিত্য বা শিল্পের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সেরকম বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। "সাহিত্যরূপ" প্রবন্ধে তিনি বলেন :

> সাহিত্যে যখন কোন জ্যোতিষ্ক দেখা দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন। তিনি যে ভাবকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেষত্ব থাকতে পারে, কিন্তু সেও গৌণ; সেই ভাবটি যে বিশেষ রূপ অবলম্বন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলীন্য। বিষয়ে কোন অপূর্বতা না থাকতে পারে, সাহিত্যে হাজার বার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিষয় হলেও কোন দোষ নেই, কিন্তু সেই বিষয়টি যে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই তার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেলায় পাথরের যুগে পাথর ও সোনার যুগে সোনাটা উপাদানরূপে নেওয়া হয়েছে, পণ্যের

> দিক থেকে বিচার করলে তার দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার রূপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়টা উপাদান, তার রূপটাই চরম। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৫)

রবীন্দ্রনাথ উপর্যুক্ত প্রবন্ধে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখের সাহিত্যকর্মের উল্লেখ করে দেখান যে, তাঁদের কিছু সাহিত্যকর্ম রূপের বিশিষ্টতা দ্বারা, রূপের পরিপূর্ণতা দ্বারা মূল্যায়নযোগ্য। এমনকি তার প্রভাবে সাহিত্যের জগৎ কতটা বিকশিত হলো তার ওপরও তাঁদের ঐ সকল সাহিত্যরূপের মান নির্ভরশীল নয়। তিনি দেখান যে, মধুসূদনের *মেঘনাদবধ কাব্য* একটি বিশেষ ধারা সূচিত করেছে। মহাকাব্যের এই ধরন বা রূপটি তাঁর পরবর্তীকালে কেউ সার্থকভাবে অনুসরণ করতে পারুক আর না পারুক তিনি যে রূপটি সৃজন করেছেন তা অনন্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তার চাইতে বড়কথা তিনি এই রূপের এক ধরনের পূর্ণতা প্রদান করেছিলেন। এখানেই মধুসুদনের সার্থকতা নিহিত বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। হেমচন্দ্রের *বৃত্রসংহার* এবং নবীন চন্দ্র সেনের *রৈবতক*-এর কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ দেখান যে, এ দুটি মহাকাব্য হলেও তা মাইকেলী ধারার মহাকাব্য নয়। তাঁরা তাঁদের মতো করে তাঁদের সাহিত্যের রূপ সৃজন করেছেন এবং তার পূর্ণতা প্রদান করতে চেষ্টা করেছেন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৫)

নন্দনতাত্ত্বিক বিচারে সাহিত্য বা শিল্পের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপাদান বা বিষয়বস্তু (content) এবং রূপের (form) মধ্যে কোন্‌টা গুরুত্বপূর্ণ এ প্রশ্নের ওপর অনেক ধরনের মতের সন্ধান পাওয়া যায়। কেউ কেউ উপাদান বা বিষয়বস্তুর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কোনো কোনো মত অনুযায়ী বিষয়বস্তুর চাইতে আকারই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আবার কোনো কোনো মত অনুযায়ী উপাদান ও আকার উভয়ই গুরুত্বপূর্ণ। (Croce, 1920 : 15) প্রখ্যাত নন্দনতাত্ত্বিক বেনেদিত্ত ক্রোচে এই বিতর্কে রূপ বা আকারের পক্ষেই তাঁর সমর্থন প্রদান করেছিলেন। তাঁর ভাষায় :

> We must, that is to say, reject both the thesis that makes the aesthetic fact to consist of the content alone (that is, the simple impressions), and the thesis which makes it to consist of a junction between form and content, that is, of impressions plus expressions. In the aesthetics fact, expressive activity is not added to the fact of the impressions, but these latter are formed and elaborated by it. The impressions reappear as it were in expression, like water put into a filter, which reappears the same and yet different on the other side. The aesthetic fact, therefore, is form, and nothing but form. (Croce, 1920 : 16)

ক্রোচের মতের সাথে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল লক্ষণীয়। আরও লক্ষণীয় যে, ক্রোচে ছিলেন প্রকাশবাদী, রবীন্দ্রনাথও সাহিত্যতত্ত্বে বা নন্দনতত্ত্বে প্রকাশবাদী বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু পাশ্চাত্য ধারার প্রকাশবাদের সাথে রবীন্দ্রনাথের কোনো তাত্ত্বিক সম্পর্ক ছিলো বলে মনে হয় না; তাঁর প্রকাশবাদ স্বকীয় ভাবসমৃদ্ধ। প্রকাশবাদী হিসেবে ক্রোচে কোন অলৌকিকত্বের আশ্রয় নেননি। তিনি আত্মসত্তার বিশ্লেষণে তার মধ্য থেকে প্রাপ্ত অনুভবের (intuition) দ্বারাই প্রকাশের প্রেরণাকে ব্যাখ্যা করেছেন। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক ভাবনায় সৃজন প্রবণতা তথা প্রকাশের প্রেরণা হিসেবে বিধাতার তথা অলৌকিকতার একটি বড়ো ভূমিকা বিদ্যমান। যেমন 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতায় তিনি বলেন :

> "... অলৌকিক আনন্দের ভার
> বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার,
> তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
> ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।"
>
> (রবীন্দ্রনাথ, ভাদ্র ১৩০৫)

তাই ক্রোচে বা অন্যকোনো পাশ্চাত্য তাত্ত্বিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তিনি সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর চাইতে রূপ (form) বা আকারকে প্রাধান্য দিয়েছেন একথা বলা চলে না।

সাহিত্যের উপাদান কোনো বিশেষ দেশকালের হলেও, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাকে যথাসম্ভব সর্বকালীন করে তোলা সাহিত্যিকের বা শিল্পীর কাজ। বাস্তব ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হোক বা অধিকতর কাল্পনিক হোক সেই সাহিত্যকর্ম বা শিল্পকর্মকে কালোত্তীর্ণ করার ওপরও, তাঁর মতে, সাহিত্যের বা শিল্পের গুরুত্ব অনেকাংশে নির্ভর করে। সাহিত্য মানুষের অন্তরের কথাকে বা অভিব্যক্তিকে বাইরে নিয়ে আসতে পারে। এই অনুভূতি বা অভিব্যক্তি যখন মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে যায়, মানুষ তাকে নিজের মতো করে পায় এবং নিজের অনুভূতির সাথে তা অনেকটা মিলে যায় তখন সেই সাহিত্য মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। "সাহিত্যের বিচারক" নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন : "প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুধু বর্তমান কাল নহে চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১০) কোনো সাহিত্য বা শিল্পকে তাই কোনো বিশেষ দেশ-কালের মাপকাঠিতে বিচার করলেই চলবে না। রবীন্দ্রনাথের মতে, তাকে বিচার করতে হবে যথাসম্ভব ব্যাপকতর কালের বিচারে। এই দিক থেকে তিনি উচ্চসাহিত্যের সাথে সাধারণ সাহিত্যকর্মের বিভেদ দেখাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন: "ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায় তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে

প্রচলিত কালের সহিত, সংকীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চ সাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১০)

রবীন্দ্রনাথের মতে, কোনো সাহিত্যিক যখন কোনো সাহিত্যকর্ম প্রকাশ করেন তখন তাকে মনে করতে হবে যে, তার অনুভূতি কতটা অন্যকে প্রভাবিত করতে পারবে। কেবল তার সমকালীন মানুষকে নয়, চিরকালীন মানুষকে নিয়েই তাকে ভাবতে হবে। কেবল তার দেশ বা সীমিত কোনো সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টিকে চিন্তা না করে তাকে চিন্তা করতে হবে কোনো বিশ্বমানের শিল্প উপহার দিতে। এটা করতে পারলেই সাহিত্য উন্নত হয় বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তিনি তাই সুস্পষ্টভাবেই বলেন : "অন্তরের জিনিসকে বাহিরের, ভাবের জিনিসকে ভাষার, নিজের জিনিসকে বিশ্বমানবের এবং ক্ষণকালের জিনিসকে চিরকালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।" [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সাহিত্যের বিচারক*] এখন প্রশ্ন উঠতে পারে একজন সাহিত্যিক কীভাবে নিজের চিন্তাকে সর্বজনীন করতে, ক্ষণকালের বিষয়কে চিরকালের করে তুলতে সক্ষম হতে পারেন। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অনেকটা ইমানুয়েল কান্টের মতো করে প্রতিভার দ্বারস্থ হয়েছেন। (Kant, 1982 : 172) রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রতিভার মাধ্যমে একজন সাহিত্যিক নিজের মনকে বিশ্বমানবের সাথে মিলিয়ে বিশ্বমানবের জন্য কাজ করতে পারেন। পর্যাপ্ত প্রতিভা না থাকলে বিশ্বমানের কাজ করা যায় না, বিশ্বমানবের হৃদয়ের অভিব্যক্তি প্রকাশ করা যায় না। তাঁর মতে, প্রত্যেক মানুষই তার মনের দ্বারা জগতের সাথে সম্পর্কিত হয়, জগতের বিভিন্ন ধারণা মনের মধ্যে প্রবেশ করে, মন জাগতিক বিষয়ে সজাগ হয়। তবে এই জ্ঞান যেহেতু কালিক তাই তার পক্ষে সর্বদা কালোত্তীর্ণ ভাবনা বা অন্য যুগের মানুষের মন, তাদের চিন্তা-ভাবনা, হাসি-কান্না বোঝা সাধারণ মনের দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রতিভার মাধ্যমে এই কাজটি সম্পন্ন হতে পারে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর মতে, প্রতিভার সাথে সর্বজনীন যোগাযোগ সম্ভব হয়ে উঠতে পারে। তিনি বলেন : "জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ মনের সহিত সত্যিকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১০) রবীন্দ্রনাথ যেভাবে সাহিত্যকে বা শিল্পকে বিশ্বজনীন হওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং চিরকালীন বা কালোত্তীর্ণ হওয়ার কথা বলেছেন তা আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করা দুরূহ বলেই মনে হয়। কেননা সমাজ-সভ্যতা সদা পরিবর্তনশীল; মানুষের রুচি, চাহিদা, নান্দনিক অনুভূতিও বিবর্তনশীল। তাই কোনো বিশেষ সাহিত্যকর্ম সর্বকালে সমাদৃত হবে এটা আক্ষরিক অর্থে আশা করা চলে না। মার্কসীয় সাহিত্যতত্ত্বে এই বিবর্তনময় সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে বা শিল্পকে মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বে শিল্প বা সাহিত্য হলো "সমাজচেতনার বহিঃপ্রকাশ (art is a form of social consciousness)". (Karl Marx.1859 : Preface) সমাজের বৈশিষ্ট্য সাহিত্য বা শিল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে মার্কসবাদ মনে করে। সমাজের পরিবর্তনে তাই কোনো

বিশেষ শিল্পের বা সাহিত্যের মূল্যমান পরিবর্তিত হতে পারে। মার্কসীয় এই দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নরকম সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তা একেবারে সাংঘর্ষিক এমনটি বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ এমনটি বলেননি যে, সর্বকালে কোনো বিশেষ সাহিত্য বা শিল্প একইভাবে সমাদৃত হবে। তিনি কেবল এমন কথা বলতে চেয়েছেন যে, যথাসম্ভব সাহিত্যকে বা শিল্পকে কালোত্তীর্ণ হতে হবে। আর শিল্প বা সাহিত্য যে কালোত্তীর্ণ হতে পারে তার প্রমাণ তো বিশ্বসাহিত্যের পরতে পরতে বিদ্যমান; এমনকি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মও এই কালোত্তীর্ণতার প্রমাণ বহন করছে। রবীন্দ্রনাথ এটাও স্পষ্ট করেন যে, কিছু সাহিত্যকর্ম আছে যা সমকালীন চাহিদা মেটানোর জন্য এমনভাবে সৃষ্টি হয় যাতে কোনো কালোত্তীর্ণতার উপাদান থাকে না। সাময়িকভাবে কোনো বিশেষ সময়ে এ সকল সাহিত্য মানুষকে আলোড়িত করলেও কালের করাল স্রোতে তা এক সময় হারিয়ে যায়। তিনি বলেন :

> ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষী সংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩১০)

রবীন্দ্রনাথ সর্বকালের প্রতি সাহিত্যিককে লক্ষ রাখতে বলেছেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আক্ষরিক অর্থে সর্বকালের জন্য কোনো সাহিত্যকে গ্রহণযোগ্য হতেই হবে। তবে তিনি যে প্রতিভার কথা বলেছেন সেই প্রতিভাবান কবি বা সাহিত্যিক নিজের যুগকে অতিক্রম করে যেতে পারেন। সাধারণ মানুষ যা অনেক পরে বুঝতে পারে প্রতিভাবান কবি বা সাহিত্যিক তা অনেক আগেই বুঝতে পারেন। কবি পি. বি. শেলি তাই বলেন : "The world should listen then and I am listening now." (Shelley, 1983 : 626)

সাহিত্যের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক নির্ণয় করা সাহিত্যবিচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা দেয়। বিশেষ করে, ইতিহাসনির্ভর সাহিত্য বা ঐতিহাসিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই মূল্যায়নের দিকটি বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। অনেকেই ঐতিহাসিক সাহিত্য বা ইতিহাসভিত্তিক সাহিত্য রচনার বিষয়টিকে ভালোভাবে দেখেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে, এর কারণ এই যে, তারা মনে করেন যে, এতে করে ইতিহাস বিকৃত হয়। [রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৫] তবে রবীন্দ্রনাথের মতে, একথা সত্য যে, ইতিহাস নির্ভেজাল সত্যের প্রতি নজর দেয়, সত্যকে নিরেট অলংকারহীনভাবে উপস্থাপনই ইতিহাসবিদের লক্ষ্য। কিন্তু সাহিত্যের লক্ষ্য বাস্তবের অনুরূপ কোন সত্যের সাক্ষ্য তুলে ধরা নয়, বরং বাস্তবে ঘটা কোনো ঘটনা বা ঐতিহাসিক সূত্রের ওপর ভিত্তি করে রসসৃষ্টি করাই সাহিত্যিকের মূল লক্ষ্য। ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন :

> ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারের প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন। মশলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন, তিনি দিন, যিনি বাটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই; কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মশলা উপলক্ষমাত্র। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৫)

রবীন্দ্রনাথ উপর্যুক্ত বক্তব্যে সুস্পষ্ট করেই একথা বলেছেন যে, ইতিহাসবিদ যেমন করে সত্যকে অনুরূপ বা আস্ত রাখেন, একজন সাহিত্যিক তা সাধারণত রাখেন না বা রাখতে বাধ্য নন। কেননা ইতিহাস এবং সাহিত্য এক জিনিস নয়, উভয়ের লক্ষ্য এক নয়। অ্যারিস্টটলের *Poetics* গ্রন্থেও এ ধরনের মত পাওয়া যায়। ইতিহাস ও কবিতার পার্থক্য করতে গিয়ে অ্যারিস্টটল দেখান যে, ইতিহাস যা ঘটে কেবল তারই নিরেট বর্ণনা তুলে ধরে। কিন্তু কবি ঘটনার অনুরূপ বর্ণনা উপস্থাপন করেন না, কবি বা শিল্পী তাঁর রূপকল্পের মতো করে শিল্প রচনা বা সৃজন করেন। বাস্তবতা বা ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি সে দায়বদ্ধ নন। অ্যারিস্টটলের মতে, কবি বা শিল্পী যা ঘটে বা ঘটেছে তারই বর্ণনা দিয়ে শেষ করেন না, তাঁরা তাও বলেন – যা ঘটতে পারতো বা ঘটলে ভালো হতো। অ্যারিস্টটলের ভাষায় :

> ... কবির কাজ যা বাস্তবে ঘটেছে কেবল তার বর্ণনা দেওয়া নয়; বরং সম্ভাব্যতা বা আবশ্যিকতার সূত্র অনুযায়ী যা যা ঘটতে পারে তাও তুলে ধরা। ইতিহাসবিদ এবং কবির মধ্যে পার্থক্য কেবলমাত্র এখানেই নয় যে, একজন [ইতিহাসবিদ] লেখেন গদ্যে, আর অপরজন [কবি] লেখেন পদ্যে। (Aristotle, 2008, ch. 9)

অ্যারিস্টটল যেমনটি করে কাব্যিক সত্যকে কবির রূপকল্পের অনুরূপ বলে তুলে ধরেছেন এবং ঐতিহাসিক সত্য বা বাস্তবতার সাথে তার হুবহু মিল না থাকার কথা বলেছেন এই দার্শনিক অভিমতটিও রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এখানে নারী (বাস্তব নারী) সম্পর্কে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> শুধু বিধাতার সৃষ্টি নহ তুমি নারী।
> পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য সঞ্চারি
> আপন অন্তর হতে বসি কবিগণ
> সোনার উপমাসূত্রে বুনিছে বসন।
> সঁপিয়া তোমার 'পরে নূতন মহিমা
> অমর করিছে শিল্পী তোমার প্রতিমা। ...

পড়েছে তোমার 'পরে প্রদীপ্ত বাসনা–
অর্ধেক মানবী তুমি, অর্ধেক কল্পনা ॥
(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ১৭৮)

ঐতিহাসিক ঘটনা কবি বা শিল্পীর হাতে পড়লে তা ঐ অর্ধেক বাস্তবতা এবং অর্ধেক কল্পনা হয়েই রূপায়িত হয়। ঐতিহাসিক শিল্প তথা নাটক, কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প ইত্যাদিতে আমরা এই উদাহরণ লক্ষ করি। উদাহরণ হিসেবে প্রখ্যাত নাট্যকার ও কবি উইলিয়াম শেক্সপিয়রের ঐতিহাসিক নাটকগুলোর কথা বলা যায়। ১৫৭৭ সালে প্রকাশিত রাফায়েল হলিনশেড লিখিত *Chronicles of England and Ireland* নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থটি অধ্যয়ন করে উইলিয়াম শেক্সপিয়র তাঁর বিখ্যাত *ম্যাকবেথ* নাটক রচনা করেন। হলিনশেড-এর গ্রন্থে দেখা যায় ১০৪০ সালে স্কটল্যান্ডের রাজা ডানকানকে হত্যা করে তার সেনাপতি ম্যাকবেথ ক্ষমতা দখল করেন। ম্যাকবেথের এই পাপের পরিণতিও ঘটে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায়। ১০৫৬ সালে ম্যাকবেথ পার্টশায়ারের যুদ্ধে ডানকানের পুত্রদের হাতে পরাজিত হন এবং ডানকানের পুত্র ম্যালকম ম্যাকবেথকে হত্যা করেন। এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে পুঁজি করে শেক্সপিয়র এক চমৎকার ট্রাজেডি রচনা করেন – যেখানে ম্যাকবেথের করুণ পরিণতি দেখে ভীতির সাথে সাথে তার প্রতি করুণারও উদ্রেক হয়। নাটকের তথা শিল্পের প্রয়োজনে শেক্সপিয়র এখানে বিভিন্ন কাল্পনিক প্লট বা দৃশ্যের অবতারণা করেন, নিয়ে আসেন নানা ধরনের অনৈতিহাসিক চরিত্র, এমনকি অবাস্তব চরিত্রও। যেমন তিনি নাটকটি শুরুই করেছেন তিনজন ডাইনির সংলাপ দিয়ে। *ম্যাকবেথ* নাটকে রয়েছে ঘটনার বাস্তবতার অতিরিক্ত অনেক চমৎকার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং মন্তব্য। রয়েছে জীবন সম্পর্কে নানারকম স্মরণীয় উক্তি। যেমন, স্ত্রীর মৃত্যুশোকে কাতর ম্যাকবেথের মুখ দিয়ে শেক্সপিয়র বলেন :

Life's but a walking shadow, a poor player
That struts and frets his hour upon the stage
And then is heard no more. It is a tale
Told by an idiot, full of sound and fury,
Signifying nothing.
(Shakespeare, 1997, Act: 5, scene : 5)

মজার ব্যাপার হলো শেক্সপিয়র ঐ একই ঐতিহাসিক ঘটনাকে ভিত্তি করে ম্যাকবেথ ছাড়া আরও দুটি নাটক রচনা করেছিলেন, যার নাম *কিং লিয়র* ও *সিম্বেলিন*। এর থেকেই বোঝা যায়, অ্যারিস্টটল-এর কাব্য-সত্য, তথা শিল্প-সত্যের সাথে ঐতিহাসিক সত্যের তফাত। অ্যারিস্টটল কাব্য তথা শিল্পকে ইতিহাসের গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়ের চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন আরও একটি কারণে, তা হলো, তাঁর

মতে, কাব্য [বা শিল্প] ইতিহাসের চাইতে অধিক ব্যাপকতর বিষয়সমৃদ্ধ, অনেক বেশি দার্শনিকতাময় এবং সর্বসাধারণের নিকট তা অনেক বেশি সমাদৃতও বটে। অ্যারিস্টটলের ভাষায় : "...কবিতা ইতিহাস অপেক্ষা অনেক বেশি দার্শনিকতাময় এবং অনেক বেশি সমাদৃত। কবিতা যেখানে সার্বিক সত্যের অভিসারী, ইতিহাস সেখানে বিশেষ তথ্যের সরবরাহকারী।" (Aristotle, 2008, ch. 9)

অ্যারিস্টটলের মতের সাথে রবীন্দ্রনাথের মতের অনেক মিল আছে – আমরা দেখতে পাচ্ছি। তবে অ্যারিস্টটল কাব্যের সাথে তথা সাহিত্যের সাথে তুলনা করে ইতিহাসকে বা ইতিহাসের গুরুত্বকে অনেকখানি খাটো করতে চেয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তেমনটি করেননি। তিনি ইতিহাসের গুরুত্বকেও যথার্থভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। এমনকি ইতিহাসনির্ভর সাহিত্যে ইতিহাসের ঘটনা রদবদলের স্বাধীনতা আছে বলে তিনি মনে করলেও তিনি এমন অভিমতও ব্যক্ত করেছেন যে, সাহিত্যে সর্বজনবিদিত ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করা কাম্য নয়। রসের প্রয়োজনে সাহিত্যিক ঘটনাকে রদবদল করতে পারেন কিন্তু তারও সীমা থাকা চাই বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। তাঁর ভাষায় :

> লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল। তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়, হঠাৎ পাঠকদের যেন একেবারে মাথায় বাড়ি পড়ে। সেই একটা দমকাতেই কাব্য একেবারে কাত হইয়া ডুবিয়া যায়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৫)

রবীন্দ্রনাথের একথায় এটাও প্রমাণিত হয় যে, প্রতিষ্ঠিত সত্যকে বিকৃতকরণ বা বিপরীতভাবে উপস্থাপন করলে সাহিত্যমূল্য নষ্ট হয়, এবং তা এই জন্যই হয় যে, পাঠক তার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠেন। কিন্তু এমন ঘটনার ব্যতিক্রমও কিন্তু লক্ষ্য করা যায়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ যে রামচন্দ্র ও রাবণের উদাহরণ দিয়েছেন তাদের নিয়ে রচিত সাহিত্য থেকেও এই ব্যতিক্রম উল্লেখ করা যায়। যেমন– *মেঘনাদবধ* কাব্যে মাইকেল মধুসুদন দত্ত রাবণকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা সর্বজনবিদিত ধারণার ব্যতিক্রম। কিন্তু তাই বলে কী ঐ কাব্যের সাহিত্যমূল্য বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে? সে যাই হোক রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ইতিহাস ও সাহিত্যের গুরুত্বকে সমন্বয় করতে চেয়েছেন এই বলে যে, ইতিহাস যে সত্য প্রদান করে তাও যেমন আমাদের প্রয়োজনীয়, তেমনি সাহিত্যে যে আনন্দরস প্রদান করে তাও মানবজীবনের জন্য জরুরি। তাঁর ভাষায় :

> কাব্যে যদি ভুল শিখি ইতিহাসে তাহা সংশোধন করিয়া লইব। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিহাস পড়িবার সুযোগ পাইবে না, কাব্যই পড়িবে, সে হতভাগ্য। কিন্তু যে ব্যক্তি

> কাব্য পড়িবার অবসর পাইবে না, ইতিহাস পড়িবে, সম্ভবত তাহার ভাগ্য আরো মন্দ। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩০৫)

ইতিহাসের সত্য ও সাহিত্যের সত্য প্রসঙ্গে আলোচনায় আরও একটু প্রাসঙ্গিক ভাবনার উল্লেখ করতে চাই। কেবল ঐতিহাসিক সত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সার্বিকভাবে বা সাধারণভাবে বাস্তবতার সাথে সাহিত্যের মিল কতটুকু থাকতে পারে? সাহিত্য কি বাস্তবতার আদলেই রচিত হবে? পূর্বে একথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাস্তব থেকে একজন সাহিত্যিক উপাদান বা মাল-মসলা সংগ্রহ করতে পারেন কিন্তু সাহিত্যিক তার ওপর কল্পনার ফানুস উড়িয়ে চলে যান অন্য কোনোখানে। এই যাওয়ার মধ্যেই তার সৃজনশীলতা বিধৃত। বলা চলে এখানেই তার সার্থকতা বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন। এখানে আরও একটু বিশেষভাবে বলতে চাই যে, রবীন্দ্রনাথের মতে, বাস্তব সত্যের চাইতে শিল্পসত্যই সাহিত্যিক বা শিল্পীর নিকট প্রাধান্য পায়। এখানে সাধারণ দর্শনে যে সত্যতা বিষয়ক ধারণা তা প্রযোজ্য নয়। দর্শনে সত্যতা বিষয়ক আলোচনা প্রধান দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে করা হয়ে থাকে। তা হলো : জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ (epistemological view point) এবং মূল্যবিদ্যক দৃষ্টিকোণ (axiological view point) থেকে। জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে জ্ঞানের সত্যতা বা নিশ্চয়তা যাচাই করা হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে সুনিশ্চিত জ্ঞান (certain knowledge) বা সত্য জ্ঞানের উৎস হিসেবে বুদ্ধিবাদ, অভিজ্ঞতাবাদ, বিচারবাদ, স্বজ্ঞাবাদ ইত্যাদি মতবাদ রয়েছে। বুদ্ধিবাদের মতে, বুদ্ধিই সত্য বা নিশ্চিত জ্ঞান দেয়। অভিজ্ঞতাবাদ অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের মাধ্যম বলে এবং সত্যজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে মনে করে। বিচারবাদের মতে, বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতা এককভাবে নিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে না; বরং এদের যৌথ প্রচেষ্টায় যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্বজ্ঞাবাদীরা স্বজ্ঞা (intuition)-কে নিশ্চিত বা সত্য জ্ঞানের মাধ্যম বলে মনে করেন। অন্যদিকে, জ্ঞানের উৎস যা-ই হোক, জ্ঞানের সত্যতা বা নিশ্চয়তা যাচাই করাও ব্যাপক অর্থে জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যারই অন্তর্গত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনুরূপতাবাদ, সঙ্গতিবাদ, প্রয়োগবাদ ইত্যাদি মতবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। অনুরূপতাবাদের মতে, সত্যজ্ঞান হলো বাস্তবের সাথে অনুরূপ জ্ঞান। কোনো বচন বা জ্ঞান যদি বাস্তবের সাথে মিলে যায় তাহলে সেই বচন বা জ্ঞান সত্য। সঙ্গতিবাদীরা জ্ঞান বা বচনের সাথে কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্য জ্ঞান বা বচনের সঙ্গতিকে জ্ঞানের সত্যতা নির্ধারণের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে, প্রয়োগবাদীরা যে জ্ঞান বাস্তবে কাজে লাগে বা ফলপ্রসূ হয় তাকেই সত্য বলে ধরে নেয়।

এবার মূল্যবিদ্যক দৃষ্টিকোণ থেকে সত্যতা নিয়ে আলোচনা করা যাক। আমরা জানি, মূল্যবিদ্যার অন্তর্গত সত্যতার বৈধতা নিয়ে আলোচনা করে মূলত যুক্তিবিদ্যা। যুক্তিবিদ্যা বচনের সত্যতা নিয়ে আলোচনা করে। কোনো যুক্তির অন্তর্গত বচনের সত্যমান ব্যাখ্যা করে। কিন্তু শিল্প সংক্রান্ত আলোচনা যুক্তিবিদ্যার বিষয় নয়। এটি

মূল্যবিদ্যার অন্তর্গত নন্দনতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। তাই যুক্তিবিদ্যার সত্যতা এখানে প্রযোজ্য নয়। নন্দনতত্ত্বে যুক্তির কোনো স্থান নেই। তাই তার অন্তর্গত বচনের যুক্তিবিদ্যক সত্যতা এখানে নির্ধারণের কোনো প্রয়োজন নেই। শিল্পে এক বিশেষ ধরনের সত্যতার মূল্যায়ন করা হয়। এই সত্যতা হলো এক ধরনের ভাবব্যঞ্জক সত্যতা। বাস্তব সত্যতা বা যৌক্তিক সত্যতা (যুক্তির অন্তর্গত বাক্যের সত্যতা) এখানে প্রযোজ্য নয়।

আমরা জানি, শিল্প হলো এক ধরনের সৃজনশীল বিষয় যা সৌন্দর্য সৃষ্টি করে, ভালো লাগার অনুভূতি ধারণ করে, রুচিবোধকে রসবোধকে তৃপ্ত করে। এটা করতে পারার ওপরই শিল্পের সত্যতা নির্ভর করে। এই সত্যতা বাস্তবের সাথে মিল-অমিল, কোনো বচনের সাথে সঙ্গতি, প্রয়োজনে লাগা না লাগার সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং ব্যক্তিক নান্দনিক বোধকে তৃপ্ত করা, সৌন্দর্য চেতনাকে জাগ্রত করা বা বিকশিত করাই এর লক্ষ্য। একজন শিল্পী যদি সৌন্দর্য সৃজন করতে মূল্যায়ন করতে সক্ষম হন তাহলে সেই দিকটিই তার সত্যের নির্ধারক। অনেকে তাই সৌন্দর্যকেই সত্য বলেছেন। যেমন জন কীট্স বলেছেন : "Beauty is truth ..." (Keats, 1973 : 210) এখানে শিল্পের সত্যতাকেই ব্যক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ শিল্প সৌন্দর্য সৃষ্টি করলেই তা সত্য। বাস্তব সত্যতা বা যুক্তির অন্তর্গত বচনের সত্যতা এখানে লক্ষণীয় নয়। বরং কবির কল্পলোকের মাধুরি দিয়ে যে সুন্দরকে সৃষ্টি করা হয় তাই শিল্পের ক্ষেত্রে সত্য। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন :

> ... "সেই সত্য যা রচিবে তুমি,
> ঘটে যা তা সব সত্য নহে। কবি, তব মনোভূমি
> রামের জন্মস্থান, অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।"
>
> (রবীন্দ্রনাথ, ভাদ্র : ১৩০৫)

অনেক শিল্পী ও শিল্পতাত্ত্বিকই মনে করেন যে, সৌন্দর্য প্রকাশ ও সৃষ্টিই শিল্পের মূল কাজ। অনেক দার্শনিক আবার সৌন্দর্যকেই কীট্সের মতো সত্য বলেছেন; যদিও তাদের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান। প্লেটো পরমসুন্দরের (absolute beauty) কথা বলেছেন। তাঁর মতে, পরমসুন্দরই হলো পরমসত্য। তিনি একে ভাবজগতের বিষয় বলেছেন। কেউ এই পরমসুন্দর তথা পরম সত্যতাকে যতটা ব্যক্ত করতে পারে শিল্পের মাধ্যমে তাহলে সেই শিল্পই প্লেটোর ভাবাদর্শে ততটা সত্য। কিন্তু প্লেটো দেখান যে, শিল্পীরা মূলত অনুকরণ করেন। তাঁর মতে, শিল্প হলো অনুকরণ (art is an imitation)। এই অনুকরণ মূলত প্রকৃত সত্য তথা ভাবের জগতের পরম সুন্দর তথা পরম সত্যের অনুকরণ নয়। শিল্পীরা মূলত পার্থিব বা অবভাসের জগতের অনুকরণ করেন তাদের শিল্পে। আর এই পার্থিব জগৎ হলো, তাঁর মতে, নকল বা মিথ্যার জগত। তাই শিল্প হয়ে ওঠে নকলের নকল তথা মিথ্যার অনুকরণে মিথ্যা।

প্লেটোর গুণমুগ্ধ ছাত্র অ্যারিস্টটলও এক ধরনের অনুকরণতত্ত্ব প্রকাশ করেছেন। তবে তাঁর এই অনুকরণবাদ তাঁর গুরু প্লেটোর অনুকরণতত্ত্ব থেকে ভিন্ন ধরনের। অ্যারিস্টটলের মতে, পার্থিব জগত নকল নয় বা মিথ্যা নয়। তাই জগতের বিষয়াবলি অনুকরণ করায় সাহিত্য বা শিল্প নকল বা মিথ্যা হয়ে যায় না। তাছাড়া, তাঁর মতে, শিল্পী বা সাহিত্যিক একান্ত যান্ত্রিকভাবে জগতের বিষয়াবলি নকল বা অনুকরণ করেন না। এ ক্ষেত্রে শিল্পীর নিজের সৃজনী প্রতিভা যুক্ত থাকে। প্রকৃতিকে দেখে বা পর্যবেক্ষণ করে শিল্পী তার ওপর ভিত্তি করে মনে মনে এক রূপকল্পের সৃষ্টি করেন এবং শিল্পের মাধ্যমে সেই রূপকল্পেরই বাস্তব প্রতিফলন দেখান। সাহিত্য বা শিল্পের এই রূপকল্প সর্বদা সত্য। এটা একান্ত শিল্পীর নিজের। তাই এর সত্যতায় কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় :

> আমি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তোমারে করেছি রচনা –
> তুমি আমারই, তুমি আমারি,
> মম অসীমগগনবিহারী ॥
> (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৫৭)

প্লেটোর মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সমকালীন ভাববাদী দার্শনিক হেগেল। তাঁর মতে, পরমসত্তাই পরমভাবে সত্য। পরমসত্তা এক বিশেষ ত্রিবিধ পদ্ধতিতে শিল্পের প্রকাশ ঘটান। এই ত্রিবিধ প্রকাশের ধারার প্রথম ধাপই হলো শিল্প। পরমসত্তার লীলা চলে সুন্দরকে নিয়ে। আর সুন্দর ও সত্য অভিন্ন। শিল্প পরমসত্তার সৌন্দর্য-লীলারই প্রকাশ। তাই শিল্পও সত্য। তবে এর মাত্রাভেদ আছে। পরমসত্তা তথা পরম সুন্দরের সাথে সাহিত্য বা শিল্প যতটুকু সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ততটুকুই সত্য। সৌন্দর্য ও সত্যের পরম প্রকাশ শিল্পে তথা জাগতিক কোন কিছুতেই হয় না। বরং পরমসত্তার সাথে সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে তার প্রকাশের তারতম্যের মধ্যেই সাহিত্য বা শিল্পের সত্যতার তারতম্য ঘটে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা দেখলাম যে, সাহিত্য তথা শিল্পের সত্যতাকে শিল্পতাত্ত্বিকরা বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এঁদের আলোচনায় বিস্তর পার্থক্য থাকলেও একটি বিষয় এদের মধ্যে সাধারণভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে, শিল্পের সত্যতা এবং বাস্তব জীবনের বা বাস্তব জগতের বিচারে সত্যতা ঠিক একরকম বিষয় নয়। আমরা সাধারণ জ্ঞানেও বিষয়টিকে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে, সাহিত্য বা শিল্প জগতের বা জীবনের সাথে হুবহু একই রকম হয় না। তবে তা বাস্তবনির্ভর বা জগত ও জীবন থেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। আমরা কোনো ছবি আঁকি বাস্তবের অনুকরণে অথবা বাস্তবের সাথে মিলিয়ে। আবার তাতে নিজের কল্পনাও মিশ্রিত থাকে। ছবি, কবিতা, গান বা নাটক কোনোটাই বাস্তব জীবনে হয়তো সত্য নয়। তবে এটা শিল্প সত্য। এখানে শিল্প হিসেবে তার কোন মিথ্যাত্ব নেই। আর আমরা যদিও জানি যে,

গল্প গল্পই, কবিতা মানবসৃষ্ট, ছবি একটি অংকিত বিষয় – তাই জাগতিক বিচারে এটা মিথ্যা; কিন্তু এর মাধ্যমে আমরা অনেক ক্ষেত্রেই বাস্তব জগতকে বুঝতে পারি। এই দৃষ্টিতে শিল্প মিথ্যা হলেও সত্যকে বোঝার সহায়ক। পাবলো পিকাশোর ভাষায় : "Art is the lie that enables to realize the truth." (www.goodreads.com/quotes/tag/art) তবে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন বাস্তবের সত্যতা শিল্পের লক্ষ্য হতে হবে তা নয়, কিন্তু শিল্পীর বা সাহিত্যিকের প্রেরণার দিকটি বা তাঁর উপলব্ধিটি যেন সত্য হয় – সেটা যেন ভণিতা না হয়। কবি তাই বলেন :

সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।
সত্য মূল্য না দিয়ে সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।

(রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮৩ : ৭৮)

সাহিত্যকর্মের কোনো সুনির্দিষ্ট অর্থ বা দর্শন থাকাটা জরুরি কিনা – এ নিয়ে সাহিত্য সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কোনো বিশেষ সাহিত্যকর্মের নানারকমের এমনকি বিভিন্ন বিরুদ্ধধর্মী অর্থ ও তাৎপর্যও অনেক সময় কারো কারো বিশ্লেষণে ধরা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে অনির্দেশ্যতা নীতির পক্ষে মত দেন। তাঁর মতে, সাহিত্যের অর্থ ও তাৎপর্য সুনির্দিষ্ট হবে এমন আশা করা যায় না। বরং একে নানান দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ থাকবে – এটাই সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক। তিনি সাহিত্যকে এক ধরনের রহস্যময় শিল্প বলেও চিহ্নিত করেন। তাঁর ভাষায় : "Literature as an art offers us the mystery which is in its unity .... " (Rabindranath, 1926) সাহিত্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক কবিতা প্রসঙ্গে তিনি এই দৃষ্টিভঙ্গি আরও সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন :

> The poem as a creation, which is something more then as an idea, inevitably conquers our attention; and any meaning which we feel in its words is like the feeling in a beautiful face of a smile that is inscrutable, elusive and profoundly satisfactory. (Rabindranath, 1926)

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার বৈচিত্র্যকে মেনে নিয়েছেন; এমনকি তাকেই স্বাভাবিক মনে করেছেন। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষে তিনি যে যুক্তি দিয়েছেন বা বাস্তবভিত্তিক কারণ তুলে ধরেছেন তা অনেকটাই মেনে নেওয়া যায়। মানুষের রুচি ও চিন্তার পার্থক্যের জন্যও বিভিন্ন ব্যক্তি কোনো বিশেষ সাহিত্যকে বিভিন্ন রকম করে

দেখতে পারেন। তবে সাহিত্যিক এমন কিছু (ইচ্ছা করেই) সৃষ্টি করবেন যা রহস্যময় এবং সরাসরি বোধগম্য নয় বা বহুঅর্থবোধক হবে – এমন মতের ক্ষেত্রে কারো কারো আপত্তি লক্ষ করা যায়। যেমন, লিও তলস্তয় মনে করেন যে, সাহিত্য বা শিল্পকে যথাসম্ভব বেশি মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তিনি আরও মনে করেন যে, সেই সাহিত্য বা শিল্প ততবেশি উন্নত বা ভালো যা অপেক্ষাকৃত অধিক মানুষের নিকট সহজে বোধগম্য। (Leo Tolsloy, 1995 : ch. 5) তবে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের বা শিল্পের সহজবোধ্যতাকে অবাঞ্ছিত মনে করেননি; তবে তাঁর মতে, বাস্তবতা হচ্ছে এমন যে, অনেকেই সহজে কোন কিছু বুঝলেই সবার মূল্যায়ন বা অর্থকরণ একই রকম হবে এমন কথা বলা চলে না। আর সাহিত্যিক সর্বদা এমন করতে পারেন বা এমন নিশ্চয়তাও দিতে পারেন না যে, সবাইকে সহজভাবে সে একই রকম করে বুঝিয়ে দিবেন। সাহিত্যে সহজ করে বলা বা কোনো কিছুকে সুনির্দিষ্ট করে বলা বাস্তবিকই অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ তাই এমন কথাও বলেছেন যে, সহজ কথা সহজ করে বলা সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্য সমালোচনা অবশ্যই গঠনমূলক হতে হবে। সমালোচনাকে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিসমৃদ্ধও হতে হবে বলে তিনি মনে করেন। সমালোচনা অর্থই কোন ভুল তুলে ধরা – এমন কথা রবীন্দ্রনাথ অনুমোদন করেননি। সাহিত্য সমালোচনায় কেবল সাহিত্যিকের ত্রুটির দিকটিই তুলে ধরা, তাঁর মতে, সাহিত্যিক নীতি-বিগর্হিত। 'সাহিত্য সমালোচনা' নামক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন :

> যে সমালোচনার মধ্যে শান্তি নেই, যা কেবলমাত্র আঘাত দেয়, কেবলমাত্র অপরাধটুকুর প্রতিই সমস্ত চিত্ত নিবিষ্ট করে, আমি তাকে ঠিক মনে করি নে। এরূপ সমালোচনার ভিতর একটা জিনিস আছে যা বস্তুত নিষ্ঠুরতা – এটা আমাকে পীড়ন করে। সাহিত্যিক অপরাধের বিচার সাহিত্যিকভাবেই হওয়া উচিত। অর্থাৎ, রচনাকে তার সমগ্রতার দিক থেকে দেখতে হবে। অনেক সময়ে টুকরো করতে গেলেই এক জিনিস আর হয়ে যায়। সমগ্র পটের মধ্যে যে ছবি আছে পটটাকে ছিঁড়ে তার বিচার করা চলে না – অন্তত সেটা আর্টের বিচার নয়। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৩৫)

আসলে রবীন্দ্রনাথ এখানে কেবল সাহিত্য সমালোচনার দিক থেকেই নয়, বরং সার্বিকভাবেই এ ধরনের গঠনমূলক সমালোচনার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনদর্শন হিসেবেই এই বিষয়টিকে অনুমোদন করেন। তিনি মনে করতেন যে, সাহিত্য, এমনকি, সবধরনের মানবিক কাজেরই সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই মানুষের কাজের ভালোত্বের কোন প্রান্তরেখা নেই। সে কারণেই তিনি মনে করেন যে, কাজকে বিচার করতে হবে কতটুকু ভালো হয়েছে তার ভিত্তিতে; আরও ভালো হতে পারলেও তার জন্য যতটা ভালো হয়েছে তাকে অবমূল্যায়ন করা যাবে না। যারা এরকম 'আরও ভালোর' সন্ধানে থাকেন তাদেরকে তিনি নিতান্তই নিন্দুক, এমনকি, অকর্মণ্য বলেও মনে করেন। তিনি তাই বলেন :

যথাসাধ্য-ভালো বলে, ওগো আরো-ভালো,
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো?
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায় ॥

(রবীন্দ্রনাথ, ২০১৪ : ১৭৮)

উপর্যুক্ত আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারের যেসকল দিক তুলে ধরা হলো তা ছাড়াও সাহিত্য ও শিল্পসম্পর্কে তিনি আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য বিভিন্ন প্রসঙ্গে প্রদান করেছেন। তবে যে সকল বক্তব্য বা অভিমত এই স্বল্পপরিসরে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্য থেকে সাহিত্যবিচারে রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে বলে মনে করা যায়। বিভিন্ন প্রসঙ্গে বা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যেসকল বক্তব্য এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে কিছু বক্তব্য অন্য অনেক সাহিত্যসমালোচক বা শিল্পতাত্ত্বিকের সাথে কিছুটা সাদৃশ্যপূর্ণ হলেও আমরা দেখেছি যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির স্বকীয়তা তাতে খুব একটা বিনষ্ট হয়নি। তাছাড়া সাহিত্য বিষয়ে তাঁর কিছু মন্তব্য বা দিকনির্দেশনা এখানে আমরা তুলে ধরেছি যা একান্তই রাবীন্দ্রিক বলা চলে – অন্য কোনো সাহিত্যসমালোচকের প্রভাবে তিনি এমন বলেছেন বলে মনে হয় না। তাই সার্বিক বিচারে একজন সাহিত্যসমালোচক বা সাহিত্যবিচারক হিসেবেও রবীন্দ্রনাথের গুরুত্ব ব্যাপকতর বলে মনে হয়।

গ্রন্থপঞ্জি

শ্রী সুহাস চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), ১৯৯০। *মার্কসবাদ ও নন্দনতত্ত্ব*, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা

Aristotle, 2008। *Poetics*, Translated by T.S. Dorsch, New York

David Hume, 1969। *A Treatise of Human Nature,* Penguin Books, London.

Benedetto Croce, 1920। *Aesthetics* (As science of expression and general linguistic), Rupa Douglas, India

Immanuel Kant, 1982। *Critique of Judgement,* Translated with Analytical Indexes by James Creed Meredith, Oxford University Press, Oxford

Carl Marx. 1859। *A Contribution to the Critique of Political Econimy,* Progress Publishers

Percy Bysshe Shelley, 1983 । *To a Skylark,* see: Alexander w. Allison and others (ed.), The Norton Anthology of Poetry, Third edition, Norton and company, New York/London

William Shakespeare, 1997 । *Macbeth,* Cambridge University Press

John Keats, 1973 (Reprinted) । *Ode on a Grecian Urn,* collected from: *Keats: Poetical Works,* Edited by H. W. Garrod, Oxford University Press, London

Leo Tolsloy, 1995 । *What is Art?,* Trans. by Alymer Meude, Penguin Books

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৩৮৩ । *ঐক্যতান*, জন্মদিন, *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ২৫ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০১৪ । *অসম্ভব ভালো, কণিকা,* দেখুন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সঞ্চয়িতা*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯৯৫ । *গীতবিতান*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা

প্রবন্ধপঞ্জি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈশাখ ১৩৪১ । 'সাহিত্যতত্ত্ব', প্রবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্তিক ১৩৩৬ । 'সাহিত্যবিচার', প্রবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কার্তিক ১৩৩৬ । 'সাহিত্য বিচার', প্রবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বৈশাখ ১৩৩৫ । 'সাহিত্যরূপ', প্রবাসী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্বিন ১৩১০ । 'সাহিত্যের বিচারক', বঙ্গদর্শন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্বিন ১৩১০ । 'সাহিত্যের বিচারক', বঙ্গদর্শন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্বিন ১৩০৫ । 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', ভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশ্বিন ১৩০৫ । 'ঐতিহাসিক উপন্যাস', ভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভাদ্র ১৩০৫ । ভাষা ও ছন্দ, ভারতী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫ । 'সাহিত্য সমালোচনা', প্রবাসী, ১৯২৮ জোড়াসাঁকো বিচিত্র ভবনে ৭ চৈত্র ১৩৩৪-এর সাহিত্য অধিবেশনের বিবরণ

Rabindranath Tagor, April 1926 । *Meaning of Art,* Lecture delivered at the Dhaka University in 1926 । See: Visva-Bharati Quarterly